বাংলা

MDC 1

একক (এক)

১। লোক সংস্কৃতি কি? লোক সংস্কৃতি কি বলতে কি বুঝ?

লোক সংস্কৃতি হলো সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত তাদের চিন্তায় ও কর্মের ঐতিহ্যনুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্টীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংস্কৃতিকে সহজ ভাষায় **লোকসংস্কৃতি** বলা হয়।

আরও সহজ ভাবে বললে লোক সংস্কৃতি হলো কোনো নিদির্ষ্ট এলাকায় বসবাস রত মানুষের মুখে মখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস , আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিই হলো লোক সংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতি ইংরেজি

লোকসংস্কৃতি ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Folklore । লোকসংস্কৃতি বা লোককতি' শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা FOLKLORE। ১৮৪৬ সালের 'লোকসংস্কৃতি বোঝাতে Popular Antiqity এবং 'লোক সাহিত্য বোকাতে Popular Literature পরিভাষা প্রচলন ছিল। তবে এ দুটি শব্দের উৎপত্তি ইংলন্ডে। ১৮৬৫ শ্রী এডওয়ার্ড টাইলার লোক সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন।

লোক সংস্কৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি –

অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "লোক সংস্কৃতির তত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান" গ্রন্থে "লোকসংস্কৃতির" সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজে অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রগতি সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য শিক্ষাগত নিরপেক্ষ প্রধানত :

এতিহ্যাশ্রয়ী বাকভাষা– অঙ্গভাষা, কারুভাষা- চারুকলা, পোষাক পরিচ্ছেদ, রান্নাবান্না, সুচ্ছন্দ, ক্রীড়া অভিনয়, উষধ, তুকতাক, প্রথা উৎসব, বিশ্বাস-সংক্রান্ত, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলাপার্বন ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত; এবং ক্ষেত্রানুসারে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার মূর্ত বা বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হলেও ; সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্বন্ধপাতের সচলতায় আদিম সমাজের হারানো অতীতে মূল প্রোথিত করে বিবর্তনের ধারায় চলমান কালের সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে আগামী দিনের বাতাবরনে সম্প্রসারিত।" যে কোন সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পরিচয় হল

শিল্প-ভাস্কর্য-সাহিত্য । একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে আহিত্যের মাধ্যমেই সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে সেখানে উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্ন সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । তাই অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, একটা অন্ত্যজ মানুষের জীবন যাত্রার সাথে লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি ওত প্রোত ভাবে জড়িত। সেই লোক সংস্কৃতির উপাদান গুলিকে আমরা মোটামুটি নিম্ন লোখিত ভাগে ভাগ

লোক সংস্কৃতির উপাদান | বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান

লোকসংস্কৃতি ভাগ বা উপাদান নিছে দেয়া আছে-

লোক সংস্কৃতির উপাদান –

(১) বস্তুকেন্দ্রিক

(২) বিশ্বাস অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক

(৩) খেলাধূলা কেন্দ্রিক

(৪) বাক্‌কেন্দ্রিক

(৫) অঙ্গ-ভঙ্গি কেন্দ্রিক

(৬) লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক।

লোক সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট

(ক) লোক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে পল্লীজীবন বা গ্রামীন জীবন কথা চিত্রে ধরা

পড়ে। কৃষিসমাজই এর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

(খ) সংহত বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ এর অবলম্বন।

(গ) লোকসংস্কৃতি সাধারণ সমষ্টি বা গোষ্ঠী বদ্ধ মানুষ।

(ঘ) লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি সাহিত্য মূলত নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি। অলিখিত।

(ড) লোক সংস্কৃতির অষ্টা বা রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।
(চ) লোকসংস্কৃতি মাধ্যম মৌখিক।
(ছে) লোকসংস্কৃতি স্মৃতি ও রতি নির্ভর
(জ) লোকসংস্কৃতি প্রাণের তাগিদে স্বতস্ফূর্ত রচনা।
(বে) সরল ও আটপৌরে সৃষ্ট এটি।
(ঞ) লোক সংস্কৃত মূলত তিহা নির্ভর।
(ট) লোক সংস্কৃতি বিবর্তনধ্মী এবং নমনীয়

লোকসংস্কৃতির উদাহরণ

লোকসংস্কৃতির উদাহরণ বলতে গেলে বলতে হয় লোকসংস্কৃতির মানুষের মুখে মুখে যে কৃষ্টি লালিত হয় সেগুলোই। যেমনঃ রীতি-নীতি, কথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার- ব্যবহার, প্রথা, ইত্যাদি।

লোকসাহিত্য কি

লোকসাহিত্য কী? বাংলায় আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলি, তা ইংরেজি 'Folklore' কথাটির অনুবাদ প্রতিশব্দ নয়। ইংরেজি 'Folklore' কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে 'Folklore' বলতে যা বুঝায় তা স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত : (1) Material folklore বা লোক-শিল্প এবং (২) Formalised Folklore বা লোকসাহিত্য। আমাদের লোকসাহিত্যকে বরং Formalised Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতেপারে। লোকসাহিত্য হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সৃজনধর্মী, কল্পনাপ্রবণ, সৌন্দর্যপিপাসু ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কাব্যিক ও গদ্যধর্মী বহিঃপ্রকাশ। মৌখিক মাধ্যমে পরিভ্রমণ ও গদ্যধর্মী বহিঃপ্রকাশ। মৌখিক মাধ্যমে পরিভ্রমণ প্রবণতা এর প্রধান লক্ষণ। কল্পনা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণে লোকসাহিত্য সৃষ্টি হলেও গ্রাম্য কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা এর মৌলধর্মে বিদ্যমান। আদিম মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কার-বিশ্বাস গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লোকসাহিত্যে।

ডক্টর মযহারুল ইসলাম বলেছেন- যে সাহিত্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য।' লোকসাহিত্যের অধিকাংশ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি,

অর্থাৎ একজন, তবে সেই একজনের সম্পদ সমগ্র জাতির সম্পদে পরিণত হলে তবেই তা হয়ে ওঠে লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি কি

লোকসাহিত্য' নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত-যা সমাজ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাবমুক্ত, সেই সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানসিকতার দ্বারা রচিত।।

দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। সংহত সমাজের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ব্যষ্টির কোনো দাবি স্বীকৃত হয় না, সমষ্টির বা সামগ্রিক দাবিই সেখানে স্বীকৃত হয়। ব্যক্তি বিশেষ সেখানে কিছুই নয় সমষ্টির জন্যই তার অস্তিত্ব ।

(তৃতীয়ত, লোকসাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয় তার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করে নেয়।

চতুর্থত, ব্যক্তি বিশেষের অপরিণত রচনা সমষ্টির হাতে পড়ে উন্নতিই লাভ করে, অধোগতি লাভ করে না।

পঞ্চমত, লোকসাহিত্য কেউ লিখে রচনা করতে পারে না; যখন এর উদ্ভব হয়, তখন এ মুখে মুখেই রচিত হয় এবং প্রথম অবস্থায় এ মুখে মুখেই প্রচারিত হয়।

ষষ্ঠত, লোক-সাহিত্যের প্রধান ধর্মই এই যে, এটা সজীব-এর ধারা ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়েই অগ্রসর হতে থাকে, মৌখিক আবৃতি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এর জীবন শক্তি রক্ষা পায় কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের বদ্ধকুণ্ডে যদি এটা গিয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে অচিরেই এর প্রাণ-শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

সপ্তমত, লোকসাহিত্যের কোনো লিখিত রূপের ভেতর দিয়ে তার প্রকৃত রস কিছুতেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না।

অষ্টমত, লোকসাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়ই সমসাময়িক কোনো সমাজ কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রচিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, সমাজের মধ্যে লোকসাহিত্য বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়, জন্মলাভ করতে দেখা যায় না। নবমত,

নবমঃ লোকসাহিত্য চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেই রচিত হয়।

দশমত, লোকসাহিত্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের অধীন নয়।

একাদশত, লোকসাহিত্যের প্রকাশ সংক্ষিপ্ত।

দ্বাদশত, লোকসাহিত্য জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়।

প্রয়োদশত, অর্থ প্রকাশের পরিবর্তে রস-সৃষ্টিই লোকসাহিত্যের লক্ষ্য।

চতুর্দশত, লোকসাহিত্যের ঢঙ ও স্টাইল সাহিত্যের ঢঙ ও স্টাইল থেকে ভিন্ন। সে যা বলতে চায়, রেখে ঢেকে বলে না, সবই বলে দেয়।

পঞ্চদশত, লোকসাহিত্যের ভাষা লোকদের নিত্যব্যবহার্য ভাষার ওপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতাই তার আসল লক্ষ্য। তার পোশাক যেমন আটপৌরে, ভাষাও তেমনি সাদাসিধে।

লোকসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা বলতে কি বোঝ

লোকসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘকাল ধরে লিখিত সাহিত্যের আলোচনা ও তার বিচার-বিশ্লেষণেই নিজেদের পরিতৃপ্ত রেখেছিলাম। অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্য বিষয়ে দৃকপাত করার কোনো প্রয়োজনই আমরা দীর্ঘকাল ধরে অনুভব করিনি। ব্যক্তিমনের সচেতন প্রয়াসে সৃষ্ট সাহিত্য প্রকাশের তাগিদ ব্যতীত খ্যাতি ও অর্থের কারণে রচিত হয়। তাই রচয়িতা তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রচারে নিজে থেকেই তৎপর হন। কিন্তু মৌখিক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য নিছক সহজ কবিত্ব শক্তি প্রকাশের আনন্দেই নিঃশেষিত। তাই প্রচারের তাগিদ সেখানে অনুপস্থিত। তবু অল্প কিছুকাল আগে বিশেষভাবে জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করলেন লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের পরিচয় ও আস্বাদ গ্রহণ না করলে জাতির সাহিত্য আলোচনা ও তার রসাস্বাদন অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট থেকে যায়। তাই নিজেদের প্রয়োজনে আমরা নিরক্ষর মানুষের রচিত মৌখিক সাহিত্যের দিকে নজর দিই।

একক দুই

১। ছড়ার সংজ্ঞা দিয়ে লোকসাহিত্যে ছড়ার বিশিষ্টতার পরিচয় দাও

ছড়া: সংস্কৃত ছটা থেকে প্রাকৃত ছড়া এবং প্রাকৃত ছড়া থেকে বাংলা ছড়ার উৎপত্তি। এর অর্থ পরম্পরা, গ্রাম্যকবিতা ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে ছড়া বলতে বোঝান হত মুখে মুখে রচিত এক বিশিষ্ট প্রকরণকে, যার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জীবনের সংযাগে থাকত, আর যার রচনাশৈলীতে থাকত ছন্দ ও ধ্বনিময়তার সুরেলা বিস্তার।

লোকসাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি ছড়া। ছড়ার মধ্যে সুর থাকলেও ছড়া কখনই লোকসংগীত নয়। ছড়ার সুরে লোকসংগীতের সুরের মত বৈচিত্র্য থাকে না। পক্ষান্তরে, কোন একটি বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে লোকসংগীত রচিত হয়। কিন্তু ছড়ায় এরকম কোন বিশেষ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। গীতিকার মত কাহিনি নয়, ছড়ায় যা থাকে তা হল কথার ছবি আঁকার চেষ্টা। আবার প্রবাদের মত ব্যঙ্গপ্রাধান্যও ছড়ায় নেই। সমাজের নানা অসংগতিতে ব্যঙ্গের চাবুক প্রবাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে শিশুমনের সঙ্গে ছড়ার থাকায় তার মধ্যে স্নেহ এবং আবেগের প্রকাশ ঘটে। সমালোচনা কিংবা আক্রমণহীন প্রশান্তিই ছড়ার প্রাণ। আবার ছড়ার সঙ্গে যখন হাততালি দিয়ে শিশুকে দোলাতে নাচান হয়, তখন শিশুর মধ্যে যে শারীরিক অনুভবের সঞ্চার হয়, তার সামাজিক তাৎপর্য অসীম। এভাবেই লোকসাহিত্যে ছড়াগুলি বিষয়, ব্যঞ্জনা এবং প্রয়োগের দিক থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলা 'ঘুমপাড়ানি ছড়া' গুলির কেন্দ্রে রয়েছে শিশু। তাকে ঘুম পাড়ানোর নানা প্রণালী এই ছড়াগুলিতে ফুটে উঠেছে। বিষয় বৈচিত্র্য এই জাতীয় ছড়ায় থাকা সম্ভব নয়। যদিও এখানে রয়েছে এক ধরনের সর্বজনীন আবেদন।
আবার ঘুমপাড়ানি ছড়াকার যখন বলেন-

"দোল দুলুনি
রাঙ্গা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখুনি
নিয়ে যাবে তখুনি"

তখন শিশুর অন্যতম আকর্ষণীয় শয্যা দোলনাকে আশ্রয় করে এমন এক ছবি তুলে ধরা হল যা আমাদের সকলকেই চিরন্তন শৈশবে পৌছে দেয়। এই চিত্রমাধুর্যই ছড়ার প্রাণ। আবার নিদ্রাহীন শিশুকে ঘুমপাড়ানোর জন্য যখন 'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি'কে আহ্বান করা হয় তখন ছড়া যেন লোকোত্তরের প্রকাশ হয়ে যায়। অথচ এর মধ্যেই আবার জীবনের অনেক অপূর্ণতাও উকি দিয়ে যায়-

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি *এসো,*
খাট নেই, পালঙ্ক নেই
আসন পেতে *বসো*।
অথবা
তাই তাই
মামার বাড়ি যাই
মামার বাড়ি ভারী মজা
কিল চড় নাই

এইভাবেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ঘুমপাড়ানি ছড়া শিশুমনকে আকৃষ্ট করে, তার চোখে নিদ্রার আবেশ তৈরি করে দেয়। ফলে, 'আঁধার ঘরের আঙ্গিনায়' ঘুমের পরি আসে যায়, সেই পরির পাখার হাওয়াতেই মায়ের কোলে জেগে থাকা ছেলের দল ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই বাংলা 'ঘুমপাড়ানি ছড়া'গুলিতে মা বা মাতৃসমাদের স্নেহভরা মনের মায়াময় বিস্তার ঘটে।

খেলার ছড়াগুলি শিশুদের নিজেদের সৃষ্টি। অনেকসময় খেলাকে অবলম্বন করে ছড়াগুলি তৈরি হয়। কখনও ছড়াকে অবলম্বন করেও খেলার পরিকল্পনা হয়। এখানে দু-ধরনের ছড়া পাওয়া যায়।

বাইরের খেলাভিত্তিক ছড়া। বাইরের গ্রামীণ খেলার অন্যতম হাডুডু-কে নিয়ে লেখা ছড়া—

"চু যা চরণে যাব।
পাতি নেবুর মাতি খাব।"

অন্দরের খেলা ভিত্তিক ছড়া। বৃষ্টির দিনে যখন বাইরে যাওয়া যায় না, সেই সময় ঘরের মধ্যে খেলায় গুণে গুণে নির্দিষ্ট কাউকে চোর ইত্যাদি বানানোর জন্য ছড়া কাটা হত-

আপন বাপন চৌকি চাপন,

ওল, ঢোল, মামার খোল

ওই মেয়েটি খাটিয়া চোর।

কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে তাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য বলা হত—

"আড়ি আড়ি আড়ি

কাল যাব বাড়ি

পরশু যাব ঘর

কি করবি কর..."।

খেলার ছড়াকে কখনও প্রশ্নোত্তরের আকারেও রূপ দেওয়া হয়। এই ধরনের খেলার ছড়ায় দেখা যায়, খেলোয়াড় হাত ধরাধরি করে দুদলে বিভক্ত হয়ে মুখামুখি দাঁড়ায়। একদল সুর করে ছড়া বলে সামনে পিছনে হাঁটে এবং অন্যদল থেকে একজনকে নিজের দলে টেনে নিয়ে আসে। এইসময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে ছড়াটি বলা হয়, সেটি হল-

এলাডিং বেলাডিং সইলো

একটি খবর আইল।

কীসের খবর আইল ?

রাজামশাই একটি বালিকা চাইল।

কোন্ বালিকা চাইল ?

এর উত্তরে প্রতিপক্ষ দলের একটি বালিকার নাম বলে তাকে নিজের দলে নিয়ে আসার চেষ্টা চলে। উলটো দলও একইভাবে একই কাজ করে। খেলার ছড়া সংঘবদ্ধতা এবং শৃঙ্খলাবাোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যদিও অঞ্চলভেদে এই খেলার ছড়ার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

২। ধাঁধা বলতে কী বোঝো? ধাঁধার সঙ্গে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদানের বিষয়টি কীভাবে জড়িত বুঝিয়ে দাও।

ধাঁধা: ধাঁধাকে ইংরেজি প্রতিশব্দ বলা হয় 'riddle', গ্রিকভাষায় এর নাম 'ainigma'। বাংলায় ধাঁধাকে হেঁয়ালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তৎসম প্রহেলিকা হল ধাঁধার বহুপরিচিত একটি সমনাম। ধাঁধা হচ্ছে এমন একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন, যেখানে মূল বিষয়টি অনুক্ত থাকে এবং পাঠক বা শ্রোতা সেই লুকোনো বিষয়কে খুঁজে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ধাঁধার বৈশিষ্ট্য: ধাঁধায় যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল-

- ধাঁধায় থাকে ভাষার প্রতি দখল, চিন্তার উৎকর্ষ এবং ছন্দ সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান।
- ধাঁধায় প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা দুজনেই সক্রিয় থাকে।
- ধাঁধা যেহেতু সক্রিয়তার চর্চা, তাই এখানে বুদ্ধির অনুশীলন যেমন ঘটে, অন্যদিক দিয়ে ধাঁধা একরকমের মানসিক ক্রীড়াও বটে।
- ধাঁধায় বুদ্ধির অনুশীলন ঘটলেও তার মধ্যে প্রবাহিত থাকে এক নির্মল হাস্যরস।
- পরিচিত এবং দৈনন্দিন জীবন থেকে ধাঁধার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। যেমন, শিল, নোড়া, উনুন, ছাতা, লাঠি ইত্যাদি।
- ধাঁধায় বর্ণ, চিহ্ন, সংখ্যা, আকার, আচরণ, গুণ ইত্যাদির দিক দিয়ে সাদৃশ্য বা তুলনা আরোপ করে সংকেত তৈরি করা হয়। যেমনএকটুখানি গাছে/কেষ্ট ঠাকুর নাচে। = বেগুন = বর্ণসাদৃশ্য

সুতরাং, ধাঁধার সঙ্গে শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদানের বিষয়টি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত ধাঁধাগুলিতে যেমন প্রকৃতির বিস্তার ঘটেছে, ঠিক সেভাবেই বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনও নানা ধরনের ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ধাঁধাগুলিতে লক্ষ্মী নারায়ণ, অগ্নি, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, মনসা ইত্যাদি নানা দেবদেবীর উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও বামুন ফকির, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা ধর্ম অনুসরণকারী শ্রেণি আর ভাগবত পুরাণের উল্লেখে ধর্মাশ্রিত বাংলাদেশের ছবি নিখুঁতভাবে

ফুটে ওঠে ধাঁধায়। চুনকাম করা ঘর কিংবা দুধভাত খাওয়া শিশুরা বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের প্রতীক হয়েই ধাঁধাতে উঠে আসে। একাধিক ধাঁধায় বিবাহসংস্কৃতির প্রতীক হয়ে এসেছে 'সোনার টোপর'। আয়না, কাজলের ফোঁটা ইত্যাদি সাজসজ্জার দৃষ্টান্ত হয়ে ধাঁধায় আসে।

ধাঁধার উত্তরের মধ্যে বঙ্গজীবনের নিবিড় রূপটি আরও স্পষ্ট হয়। বেশ কিছু ধাঁধার উত্তরে থাকে বাংলাদেশের পরিচিত ফল, প্রাণী ইত্যাদি। অবসর বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হুকা এবং কলকেও কোন কোন ধাঁধায় উত্তর হিসেবে উঠে এসেছে।

লংকা, বেগুন, নারকেল, পেঁয়াজ, সজনে, ডুমুর, আনারস, পাট ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করেও বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে।

আগেকার দিনে নিম্নবর্ণের মানুষরা বিশ্বাস করত ধাঁধার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে। কখনও কখনও বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও ধাঁধার ব্যবহার চলত। সুতরাং, যে ধাঁধা এখন নিছকই শিশুমনের খাোরাক, তার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কিন্তু কোনাোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।